Şehit

?????? ???? ????

Doğum tarihi:	23 Haziran, 1993
Şehadet tarihi:	18 Aralık, 2025
Bölge:	Barishal
İlçe:	ঝালকাঠি

Şehitlik Olayı ve Detayları

কুলকাঠির রক্তমিছিল

ঝালকাঠি সদর উপজেলার পোনাবালিয়া ইউনিয়ন এবং নলছিটি উপজেলার কুলকাঠি ইউনিয়নের সীমানা পাশাপাশি। জায়গাটির ঠিক কোলঘেঁষে নীরবে বয়ে চলেছে ছোট্ট নদী সুগন্ধা। সময়টা বিশের দশকের শেষভাগ। ব্রিটিশ শাসনেই চলছে গোটা ভারতবর্ষ। ঝালকাঠিতে জন্ম নেওয়া বৃহত্তর বরিশালের সাহসী সন্তান শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক তখন দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজনীতি করছেন। পোনাবালিয়া ইউনিয়নে হিন্দু সম্প্রদায়ের তীর্থস্থান শিববাড়ির অবস্থান। প্রতি বছর শিবচতুদর্শী উপলক্ষ্যে সেখানে বিরাট মেলা বসে। বাদ্য-বাজনা বাজানো হয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা মনের আনন্দে সময় কাটায়, উৎসব করে।

১৯২৬ সালের দিকে পার্শ্ববর্তী নলছিটি উপজেলার কুলকাঠি গ্রামে একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন মুসলমানরা। জামে মসজিদ। তারাও মনের আনন্দ নিয়ে ইবাদত-বন্দেগি করেন, আল্লাহর দরবারে দুনিয়া এবং পরকালের কল্যাণের জন্য ধরনা দেন। এ সময়টার বছর দুয়েক আগে মন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন শেরে বাংলা। তিনি আছেন 'নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতি' নামক একটি রাজনৈতিক দল গড়ার চেষ্টায়। নানান ব্যস্ততা তাঁর। যে বছর তিনি রাজনৈতিক দল খুলে ফেললেন, ঘটনাটি ঘটল সে বছরই। তাঁর জন্মজেলা ঝালকাঠির কুলকাঠি গ্রামে। তারিখ ১৯২৭ সালের ২ মার্চ। বাকেরগঞ্জ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তখন ইএন ব্লান্ডি।

শিবচতুদর্শীর মেলা চলাকালীন সময়ে হিন্দুরা ঢোলের বাদ্য বাজিয়ে মসজিদ সংলগ্ন রাস্তা দিয়েই সেখানে যাতায়াত করত। এতে মুসলমানদের ইবাদতে ব্যাঘাত ঘটতে লাগল।

কুলকাঠি মসজিদের ইমাম মৌলভী সৈয়দ উদ্দিন মুসল্লিদের নিয়ে হিন্দু নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনা করলেন। কিন্তু কোনোই লাভ হলো না। দ্বৈরথ বাড়তে লাগল। একপর্যায়ে দুই পক্ষ কঠোর অবস্থানে চলে গেল—মুসলমানরা মসজিদের সামনে দিয়ে হিন্দুদের ঢোলের বাদ্য বাজিয়ে যেতে দেবে না, অন্যদিকে হিন্দুরা মসজিদের সামনে দিয়ে বাদ্য বাজাতে বাজাতেই মেলায় যাবে। মুহূর্তেই অশান্ত হয়ে উঠল শান্ত জনপদ কুলকাঠি।

বিখ্যাত হিন্দু নেতা সতীন্দ্রনাথ সেন দলবল নিয়ে হাজির হলেন সেখানে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ইএন ব্লান্ডি, পুলিশ সুপার মি. টেলর এবং সদর এসডিও জিকে বিশ্বাসও গুর্খা বাহিনী নিয়ে চলে এলেন। তুমুল বাকবিতণ্ডা শুরু হলো দুই পক্ষের মধ্যে। একপর্যায়ে মুসলমানরা বললেন—নিজেদের শরীরে মাথা থাকতে তাঁরা হিন্দুদেরকে মসজিদের সামনে দিয়ে ঢোল বাজিয়ে যেতে দেবেন না। হিন্দুদের মধ্যে টুকটাক ইংরেজি জানা লোক ছিল। তারা ইএন ব্লান্ডিকে ভুল বোঝালো—মুসলমানরা কারও শরীরে মাথা রাখবে না বলে হুমকি দিয়েছে। এই মিথ্যা খণ্ডন করার সাধ্য মুসলমানদের ছিল না। কারণ ইংরেজি জানতেন না তাঁরা।

এর পরে যা ঘটল, তার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না কুলকাঠি। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ব্লান্ডি হিন্দু নেতাদের মিথ্যা কথা শুনে মুসলমানদের ওপর গুলি করার নির্দেশ দিলো গুর্খা সৈন্যদের। ফায়ার করতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হলো না। ঘটনাস্থলেই ১৯ জন মুসলমান শাহাদাত বরণ করলেন। আহত হলেন অগণন। পুরো বাকেরগঞ্জ জেলাসহ দেশজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এলো। ময়নাতদন্তের পর স্থানীয় হেমায়েত উদ্দিন মাঠে অনুষ্ঠিত হলো শহীদদের নামাজে জানাজা। হাজার হাজার শোকাহত জনতা অংশ নিলেন সেই জানাজায়। পরবর্তীতে শেরে বাংলা গেলেন কুলকাঠিতে। শহীদদের স্মরণে সেখানকার নামকরণ করলেন শহীদিয়া। শহীদ মুসলমানদের পরিবারকে সরকার থেকে জমির ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু সেই দাগ কি আর মোছা গেল?

শেরে বাংলা থেকে শরিফ ওসমান হাদি

নব্বই দশকের প্রারম্ভ। ঐতিহাসিক কুলকাঠি হত্যাকাণ্ডের ছেষট্টি বছর পেরিয়েছে। কুলকাঠি থেকে মাইল কতকের দূরত্বে নলছিটি উপজেলা সদর। এখানেই এক অতি সাধারণ বাড়িতে স্থানীয় বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন শরিফ মাওলানা আবদুল হাদির ঘর আলোকিত করে এলো তাঁর ষষ্ঠ এবং শেষ সন্তান। বড়ো দুই ছেলে আবু বকর সিদ্দিক এবং ওমর ফারুকের পর ছোটো ছেলের নাম রাখলেন ওসমান গনি। এই ছেলেই পরবর্তী ইতিহাসে পরিচিত হবেন 'শরিফ ওসমান হাদি' নামে। ওসমান যে বছর পৃথিবীতে এলেন, তার প্রায় একত্রিশ বছর আগে ঢাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক।

জীবনের বিস্ময়কর চিত্রনাট্যে জন্মের বত্রিশ বছর পর শরিফ ওসমান হাদি এক বর্ণাঢ্য মৃত্যু নিয়ে যেখানে সমাহিত হবেন, সেখান থেকে শেরে বাংলার কবর মাত্র মাইল খানেকের দূরত্বে।

ঝালকাঠিতে জন্ম নেওয়া এ দুই সাহসী সন্তান কেয়ামত পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে ঘুমিয়ে থাকবেন পাশাপাশি। শেরে বাংলা যেভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে জীবন্ত, ঠিক একই রকমভাবে ইতিহাসে জীবন্ত থেকে যাবেন শহীদ শরিফ ওসমান হাদিও। বহু বছর আগে শেরে বাংলা বলে গিয়েছিলেন, 'যখন দেখবে কলকাতার দাদাবাবুরা তোমার প্রশংসা করছে, তখন বুঝবে—তুমি তোমার দেশের বিরুদ্ধে কাজ করছ।' শরিফ ওসমান হাদি যেন তাঁর পূর্বপুরুষের বলা এই উক্তিরই নতুন বার্তাবাহক হিসেবে আবির্ভূত হতে চলেছেন!

প্রতিবাদী মিছিলের অগ্নিবালক

২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচন ঘনিয়ে আসছে। ওসমান হাদির বয়স তখন সবে আট বছর। শান্ত-স্নিগ্ধ মফস্বল নলছিটিতে বাবা-মা আর বড়ো ভাই-বোনের অপত্য স্নেহে বেড়ে উঠছেন তিনি। কিন্তু আজন্ম নজরুলের গুণমুগ্ধ এই বালক যেন তার প্রিয় কবির মতোই দস্যি ছেলে। কিছুতেই ঘরে আটকে রাখা যায় না। মিছিল, স্লোগান, বক্তৃতা চুম্বকের মতোই আকর্ষণ করে তাকে। প্রায়শই নলছিটি উপজেলা বিএনপির অফিসে গিয়ে বসে থাকেন। ঝালকাঠি-২ (সদর, নলছিটি) আসনে চারদলীয় জোটের প্রার্থী তখন ইসরাত সুলতানা ইলেন ভুট্টো। ছোট্টো বালক ওসমানকে মাঝে মাঝেই তার মিছিলে দেখা যেতে লাগল। 'হাদি হুজুরের ছেলে' পরিচয়ে সবাই বিশেষ খাতির করে তাকে। এমনকি সেই বয়সে একবার মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতাও দিয়ে ফেললেন ছোট্ট বালক।

সে-ই হলো শুরু, স্লোগান কিংবা বক্তৃতা শেখার গোড়াপত্তন। নলছিটির আকাশ, বাতাস, গ্রহ, তারা জানে না—এই বালকের স্লোগান একদিন ঘাপটি মেরে থাকা ফ্যাসিবাদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেবে। বাড়ির পাশে বয়ে চলা শান্ত নদী সুগন্ধার প্রবাহ জানে না—এই কিশোরের অগ্নিঝরা বক্তব্য রাতের ঘুম হারাম করে দেবে ভারতীয় আধিপত্যবাদপন্থিদের। যারা নিজেদের স্বার্থের জন্য দেশ বিক্রি করে দিতে দ্বিধান্বিত হয় না, মাথা নুইয়ে মেনে নেয় ভারতীয় আধিপত্যকে; এই ছোট্টো ওসমানই একদিন বড়ো হয়ে তাদের মাথাব্যথার কারণ হবেন। এমনকি দুনিয়া থেকেই সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হবে এই দেশপ্রেমিককে। কাজটির জন্য তারা বেছে নেবে বৃহত্তর বরিশালেরই আরেক নষ্ট যুবককে। টিক টিক টিক! বয়ে চলেছে সময়।

নেছারাবাদের সবুজ চত্বরে

মাওলানা আযীযুর রহমান কায়েদ নেছারাবাদী রাহিমাহুল্লাহ দক্ষিণবঙ্গের একজন প্রথিতযশা আলেমে দ্বীন ও শিক্ষক। ওই অঞ্চলের মানুষের কাছে 'কায়েদ ছাহেব হুজুর' নামেই সমধিক পরিচিত তিনি। বিশ্ববরেণ্য মুফাসসীরে কুরআন আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীসহ অসংখ্য কৃতী ছাত্রের সরাসরি শিক্ষক ছিলেন। দীর্ঘ ২৬ বছর শর্ষিনা মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন তিনি। তাঁরই হাত ধরে পঞ্চাশের দশকে ঝালকাঠি জেলা শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি ফোরকানিয়া মাদরাসা। সেই ছোট্ট উদ্যোগই আজকের মহীরুহ ঝালকাঠি নেছারাবাদ সালেহিয়া কামিল মাদরাসা। সংক্ষেপে মাদরাসাটি 'এন এস কামিল মাদরাসা' নামেও পরিচিত। শিক্ষা কার্যক্রমের দিক থেকে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মাদরাসাগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম।

এই মাদরাসাতেই ছেলে ওসমান হাদিকে পড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন বাবা মাওলানা আবদুল হাদি। ততদিনে বাবার মাদরাসায় ক্লাস থ্রির পাঠ শেষ হয়েছে বালক ওসমানের। এবার তাকে ছাড়তে হবে প্রিয় মফস্বল নলছিটি, যেতে হবে জেলা শহর ঝালকাঠিতে। একদিন ঘোরলাগা চোখে বাবার সঙ্গে নেছারাবাদ মাদরাসার বিশাল প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালেন কৌতূহলী বালক। পেছনে ফেলে এলেন মায়ের সঙ্গে রোদ পোহাবার স্মৃতি, বোনের সঙ্গে মাঠে ঘুরতে যাবার অতীত। তাঁর চোখের সামনে হাজার হাজার সাদা টুপি আর সাদা পাঞ্জাবি পরা ছাত্রের শ্বেতশুভ্র সমুদ্র ঢেউ খেলছে। সেই ঢেউয়ে সামিল হলেন ছোট্টো ওসমানও। এবার তাঁর জীবন নোঙর ফেলল এক অন্য মোহনায়।

মাদরাসার নিয়ম-নীতি অত্যন্ত কঠোর, অনেকটা সেনাবাহিনীর মতো। হাজার হাজার মেধাবীর পদচারণায় মুখরিত ক্যাম্পাস নেছারাবাদ। এটি কেবল ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্রই নয়, বরং সুষ্ঠু সংস্কৃতির এক চারণভূমিও বটে। বালক ওসমান বহুমুখী প্রতিভাবান। তিনি কেবল পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকার ছেলে নন, জ্ঞানের বহুমাত্রিক দিকে কৌতূহল তার। আকাশের বিশালতায় ডানা মেলতে চান তিনি। নেছারাবাদ মাদরাসা তাকে সেই সুযোগ তৈরি করে দিলো। বড়ো ভাই ড. মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকও ছিলেন সেই মাদরাসার শিক্ষক। প্রায়শই বাবা মাওলানা আবদুল হাদি নলছিটি থেকে এসে দেখে যেতেন আদরের ছোটো ছেলেকে। শরীরের দিকে খেয়াল রাখার সর্বোচ্চ তাগিদ দিতেন।

সবার বাবারা যেখানে ছেলেদের বেশি বেশি পড়তে বলতেন; ওসমানের বাবা সেখানে বলতেন অল্প অল্প পড়তে, বিকেলে না পড়তে, রাত দশটার পর না পড়তে। হোস্টেলের বাকি ছেলেরা অসীম বিস্ময়ে বাবা-ছেলের কথোপকথন শুনত। এমনও বাবা হয়! ক্লাসের পড়াশোনার পাশাপাশি নানাবিধ এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসে ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়লেন ওসমান হাদি। উপস্থিত বক্তৃতা, উপস্থাপনা, নাটক, সংগীত, বিতর্ক প্রতিযোগিতা; সবকিছুতেই দুর্দান্ত পারদর্শিতা তাঁর। প্রতি বছর একসঙ্গে বেশ কয়েকটা শাখায় প্রথম হতেন ওসমান। কিন্তু নিয়ম ছিল—একজন একাধিক শাখায় বিজয়ী হলেও পুরস্কার কেবল তিনটিই নিতে পারবে। বাবা পরামর্শ দিলেন—তিনটির বেশি শাখায় অংশ না নিতে, যেন ওই পুরস্কারটা অন্য কেউ পায়।

২০০৭ সালে নেছারাবাদ মাদরাসা থেকে দাখিল পরীক্ষায় অংশ নিলেন চৌদ্দ বছরের বালক ওসমান হাদি। ইতিমধ্যেই তাঁর ঝুলিতে স্থান পেয়েছে অসংখ্য পুরস্কার। ভাষার প্রতি বিস্ময়কর আকর্ষণ তাঁর। বাংলা, ইংরেজি, আরবি; তিন ভাষাতেই আছে অসম্ভব দখল। দাখিল পরীক্ষা দিয়েই আরও ভালো ইংরেজি শেখার মানসে সাইফুরসে কোচিং করতে ঢাকায় চলে এলেন ওসমান হাদি। একজন শিক্ষক তাঁকে পরামর্শ দিলেন ঢাকা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট ভর্তি হবার জন্য। কিন্তু তিনি নেছারাবাদ মাদরাসাতেই আলিম করার ব্যাপারে সিদ্ধান্তে অটল। কারণ তাঁর ঢাকার নামিদামি কলেজে পড়া বন্ধুরা বাংলা ভালো জানবে, ইংরেজি ভালো জানবে। নেছারাবাদে বসে ওসমানও ভালো শিখে নেবেন এগুলো। পাশাপাশি তাঁর আরবির দক্ষতা যে আরও ঋদ্ধ হবে, তা ঢাকার নামিদামি কলেজে পড়া বন্ধুদের নেই। এখানেই এগিয়ে থাকবেন তিনি।

শহীদি রণক্ষেত্রের হাতছানি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের করিডর থেকে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবর অনেকটা চোখে পড়ার দূরত্বে। শাহবাগ মোড়ও খুব বেশি দূরে নয়। ওসমান হাদি আলিম শেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে পড়তে চাইলেন। কিন্তু বাবা শরিফ মাওলানা আবদুল হাদির ইচ্ছে–তিনি ছেলেকে বড়ো ইসলামিক স্কলার বানানোর জন্য মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পাঠাবেন। পিতা-পুত্রের মধ্যে আলোচনা চলতে লাগল। পিতা একপর্যায়ে সম্মতি দিলেন। তাঁর মনে পড়ল প্রায় পৌনে একশ বছর আগের কুলকাঠি হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি। সেদিন মুসলমানরা কেবল ইংরেজি না জানার দরুন নির্মম মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন।

মাওলানা আবদুল হাদি নলছিটির সবচেয়ে বড়ো মসজিদের খতিব, স্বনামধন্য একটি মাদরাসার ভাইস প্রিন্সিপাল। পুরো উপজেলাজুড়ে সর্বজনশ্রদ্ধেয় তিনি। জীবনে বহু মানুষকে নিয়ে বহুবার মুনাজাত করেছেন। প্রত্যেক মুনাজাতে বালাকোটের শহীদ, কুলকাঠির শহীদদের জন্য দোয়া করেছেন তিনি। আজ ছেলের আবদারের সামনে দাঁড়িয়ে কুলকাঠির শহীদদের কল্পছবি ভেসে উঠল মনে। ছেলেকে বললেন, 'ঠিক আছে। তোমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার অনুমতি দিচ্ছি এক শর্তে–আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে, ভালোভাবে ইংরেজি শিখে এই দুর্ভাগা মুসলিম উম্মাহর কাজে লাগবে তুমি।' এর বছর দুয়েকের মাথায় ভদ্রলোক ইন্তেকাল করলেন। বেঁচে থাকলে তিনি দেখতে পেতেন–তাঁর এই ছেলে মুসলিম উম্মাহর কেবল কাজেই লাগেনি, আস্ত একটি জাতিকে নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে গেছে!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়ে গেলেন ওসমান হাদি। দ্বিতীয় দিনের ক্লাস চলছে। পাজামা-পাঞ্জাবি আর টুপি মাথায় ক্লাসের প্রথম বেঞ্চে বসেছেন তিনি। শিক্ষক ক্লাসে এলেন, পড়া ধরলেন। ওসমান হাদির কোনো একটা ইংরেজি শব্দের উচ্চারণ নিয়ে কটাক্ষ করলেন শিক্ষক। বললেন, 'মাদরাসা থেকে আসা মোল্লাদের ইংরেজি তো এমনই হবে!' কথাটা হৃদয়ে গিয়ে আঘাত করল ওসমান হাদির। তিনি সঙ্গে থাকা পকেট ডিকশনারিটি বের করলেন। সেই ইংরেজি শব্দটির উচ্চারণ দেখলেন–একদম ঠিক আছে। উঠে দাঁড়িয়ে শিক্ষককে দেখালেন সেটি। এবার শিক্ষক মেজাজ হারিয়ে বসলেন, 'তুমি কোথাকার কোন ছোকরা আমাকে চ্যালেঞ্জ কর? আমি ভুল বলেছি? আমি?' এরপর প্রথম বেঞ্চ থেকে উঠিয়ে ক্লাসের একদম শেষ বেঞ্চে পাঠিয়ে দিলেন ওসমান হাদিকে।

এই কাজটি শিক্ষক কেন করলেন? এক ধরনের তাচ্ছিল্য থেকে। যেহেতু মাদরাসা থেকে এসেছে, যেহেতু পাজামা-পাঞ্জাবি আর টুপি পরে; সেহেতু সে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর অংশ। সে ভালো ইংরেজি জানতে পারবে না। শরিফ ওসমান হাদি পরবর্তীতে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'আমি তখন এ কারণে পাজামা-পাঞ্জাবি-টুপি পরিনি যে, এগুলো পরলে সওয়াব হবে আর প্যান্ট-শার্ট পরলে পাপ হবে। আমি পাজামা-পাঞ্জাবি আর টুপি পরে ক্লাসে গিয়েছিলাম আমার কালচারাল লড়াইয়ের অংশ হিসেবে।' প্রকারান্তরে এ ঘটনার মধ্য দিয়ে এই অঘোষিত লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়লেন ওসমান হাদি। তাঁর মতে–বাংলাদেশ মুসলিমপ্রধান দেশ হলেও সাংস্কৃতিকভাবে খোদ মুসলমানরাই এখানে সংখ্যালঘু। শাহবাগ হলো এই জনপদের 'কালচারাল হাব'। নিয়তিই কি তাঁকে সেই শাহবাগ আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে টেনে এনে ফেলল?

সেই সময়ই শাহবাগের উত্থান হলো মূলত। জামায়াতে ইসলামীর সাবেক অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল শহীদ আবদুল কাদের মোল্লার রায়কে কেন্দ্র করে জমে উঠল তথাকথিত গণজাগরণ মঞ্চ। এই মঞ্চ এমনকি বিচারকের রায়কেও পালটে দেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করল। বদলে গেল রায়। শাহবাগীদের দাবির মুখে যাবজ্জীবন পরিণত হলো ফাঁসিতে। ২০১৩ সালের ১২ ডিসেম্বর রাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ফাঁসি কার্যকর করা হলো মজলুম এই ইসলামী রাজনীতিকের। ওসমান হাদি তখন বোনের পরিবারের সঙ্গে রামপুরায় থাকেন। একজন মজলুম মানুষকে বিনা দোষে এভাবে ফাঁসিতে ঝুলতে দেখার দৃশ্যটা নিতে পারলেন না তিনি। ফ্লোরে গড়াগড়ি করে কাঁদতে লাগলেন। এই দেশপ্রেমিক তরুণ তখনও জানেন না–সেই দিনটির ঠিক এক যুগ পরে স্বৈরাচারমুক্ত বাংলাদেশে আধিপত্যবাদের বুলেট এসে একই দিনে ঝাঁঝরা করে দেবে তাঁর শরীর।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে রামপুরায় অনবদ্য ভূমিকা পালন করেন ওসমান হাদি। মূলত ৫ আগস্ট স্বৈরাচারের পতনের পর ব্যাপক পরিচিত হয়ে উঠতে শুরু করেন তিনি। সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের অংশ হিসেবে কয়েকজনকে সাথে নিয়ে গঠন করেন ইনকিলাব মঞ্চ। সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনমূলক সমালোচনা অব্যাহত রাখেন। শহীদদের মর্যাদা সমুন্নত রাখা, জুলাইয়ের চেতনাকে বিক্রি হতে না দেওয়ার প্রত্যয়ে লড়ে যেতে থাকেন বিরামহীন। সেই শাহবাগকে ঘিরেই চলতে থাকে তাঁর ওঠাবসা। ইনকিলাব কালচারাল সেন্টারের অফিস নেওয়া হয় শাহবাগের নিকটেই–বাংলামটরে। সেই সাথে শাহবাগ, রমনা, পল্টন, মতিঝিল, শাহজাহানপুর এলাকা নিয়ে গঠিত ঢাকা-৮ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন ওসমান হাদি। এ সবই ছিল তাঁর লড়াইয়ের অংশ। অথচ পর্দার অন্তরালে প্রস্তুত হচ্ছিল তাঁর শাহাদাতের মঞ্চ।

ভারতীয় আধিপত্যবাদের হৃদকম্পন

ধর্মের ভিত্তিতে দেশের সীমানা বিভক্তির মধ্য দিয়ে সাতচল্লিশে গঠিত হয় দুটি স্বাধীন দেশ ভারত এবং পাকিস্তান। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দুটি অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র শুরু করে তার যাত্রা। কিন্তু দেশটির দুই অংশের মাঝখানে সুবিশাল দেশ ভারত। বিশেষত ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ ভারতের অনেকটা পেটের ভেতর। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ভারত শত্রুর চোখ দিয়ে দেখে এসেছে পাকিস্তানকে। কিন্তু দুই পাকিস্তান একসাথে থাকায় তারা তেমন সুবিধা করে উঠতে পারছিল না। বিশেষত তাদের পেটের ভেতরে থাকা পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন অধরাই থেকে যাচ্ছিল। দুঃখজনক বাস্তবতা হলো–পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করতে থাকে। ফলে দুই পাকিস্তান আলাদা হয়ে যাওয়া অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায় ইতিহাসের সামনে।

পূর্ব পাকিস্তানিরা তুমুল সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে। যাত্রা শুরু হয় নবগঠিত রাষ্ট্র বাংলাদেশের। সেই সংগ্রামের একপর্যায়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির দুরভিসন্ধি নিয়ে ঢুকে পড়ে ভারত। যুদ্ধটি বাংলাদেশ-পাকিস্তানের হলেও পাকিস্তানি সৈন্যরা ভারতীয় মিত্রবাহিনীর প্রধান জগজিৎ সিং আরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করে। বাংলাদেশের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীকে অনুপস্থিত রাখা হয় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সেই আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে। এদিকে দেশজুড়ে লুটপাট করতে থাকে ভারতীয় সৈন্যরা। এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে খোদ মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল গ্রেফতার হন। স্বাধীন বাংলাদেশের তিনিই প্রথম রাজবন্দি। অসংখ্য ইতিহাসবিদ ঐতিহাসিক তথ্যের বরাতে দাবি করেন–১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডও মূলত সংঘটিত করে ভারতীয় সৈন্যরা।

সেই হত্যাযজ্ঞে প্রাণ হারানো শহীদ বুদ্ধিজীবী মুনীর চৌধুরীর ছেলেও সম্প্রতি স্টার নিউজে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দাবি করেছেন–পাকিস্তানিরা নয়, তাঁর বাবাকে হত্যা করেছে মূলত ভারতীয়রা। জহির রায়হানের ক্ষেত্রেও একই পরিণতি ঘটেছে। একটি টকশোতে এসে বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক ও সাবেক সেনা কর্মকর্তা মেজর দেলোয়ার হোসেন দাবি করেন–বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন শহীদ হয়েছেন ভারতীয় এয়ারফোর্সের গুলিতে। এ সংক্রান্ত একটি বই লিখেছিলেন তিনি। নাম–'বাংলাদেশের বীরগাঁথা।' কিন্তু বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনের হত্যার সঙ্গে ভারতীয় সৈন্যরা জড়িত ছিল, এই তথ্যটি প্রকাশ হয়ে যাবার আশঙ্কায় সেই অংশটুকু বাদ দিয়ে বইটি ছাপাবার অনুমতি দিয়েছিল তৎকালীন আওয়ামী সরকার। নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে বরাবরই বাংলাদেশে নিজেদের পুতুল সরকার বসানোর পাঁয়তারা করে এসেছে ভারত। হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী সরকার ছিল এর সর্বশেষ উদাহরণ।

কিন্তু বিগত অর্ধ শতাব্দীতে এই জনপদের অনেক স্বাধীন সন্তান আজাদীর জন্য লড়ে গেছেন, জীবনের বিনিময়ে হলেও সমুন্নত রাখতে চেয়েছেন স্বাধীনতা-সার্বভোমত্বকে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ছিলেন এই লড়াইয়ের প্রাথমিক সময়ের সিপাহসালার। তাঁকে জীবন দিয়ে চুকাতে হয়েছে মূল্য। আর এই লড়াইয়ের সর্বশেষ শহীদ সেনাপতির নাম শহীদ শরিফ ওসমান হাদি। বিগত দেড় বছরে মিডিয়াতে ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা তাঁর চাইতে উচ্চকিত কোনো কণ্ঠ আমরা শুনতে পাইনি। তিনি এক বক্তব্যে বলেছিলেন–শহীদ জিয়ার বিএনপিকে ভারতের দাস হইতে দেবেন না, নিজামী-সাঈদীর জামায়াতকে ভারতের দাস হইতে দেবেন না, জুলাই শহীদদের রক্তের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা এনসিপিকে দিল্লির দাসত্ব করতে দেবেন না। এভাবে ক্রমেই ওসমান হাদি হয়ে ওঠেন ভারতীয় আধিপত্যবাদের মূর্তিমান আতঙ্ক, তাদের হৃদকম্পন।

দ্য ম্যান, দ্য মিথ!

গুলিবিদ্ধ হবার মাত্র দিন দুয়েক আগে সময় টিভিতে একটি সাক্ষাৎকার দেন শহীদ ওসমান হাদি। সেখানে তাঁকে বলতে শোনা যায়–'রাজনীতিবিদের মৃত্যু বাসায় হতে পারে না। এটা কোনো ভালো মৃত্যু না। যিনি রাজনীতি করেন, যিনি লড়াই করেন, যিনি সংগ্রামী; তার মৃত্যুটা হবে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, রাজপথে। একটা গ্লোরির মৃত্যু। আমি তো ভীষণভাবে প্রত্যাশা করি, ছোটোবেলা থেকেই এই স্বপ্নটা দেখি–অন্যায়ের বিরুদ্ধে কোনো একটা তুমুল মিছিল হচ্ছে। সে মিছিলের সামনে আমি আছি। একটা বুলেট এসে হয়তো আমরা বুকটা বিদ্ধ করে দিয়েছে। সেই মিছিলে হাসতে হাসতে শহীদ হয়ে গেছি। আমি একটি ইনসাফের হাসি নিয়ে আল্লাহর কাছে পৌঁছতে চাই।' আল্লাহর তাঁর প্রিয় বান্দার দোয়া কবুল করতে এত অল্প সময় নিলেন! ভাবতেই অবাক লাগে আজ। কী ভীষণ ঈর্ষা হয় শহীদকে!

প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের উদ্দেশে একবার তাঁকে বলতে শোনা যায়–'আপনাকে যদি হত্যা করা হয়, তার বিনিময় যদি বাংলাদেশ গড়ে যেতে পারেন; আগামী এক হাজার বছর বাংলাদেশের মানুষ নামাজে প্রার্থনায় আপনার জন্য দোয়া করবে।' অথচ এই বক্তব্যটি শহীদ ওসমান হাদির নিজের জন্যই আজ সত্যি হয়ে গেছে। কত কত মানুষের দোয়া নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকবেন শহীদ! নিরাপত্তা ইস্যুতে প্রশ্ন করা হলে বলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত বুকে বা মাথায় গুলি না লাগবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব না। তবে কেউ আমাদের গুলি করে মেরে ফেললে তাদের ধরে যেন বিচার করা হয়। সেটি করতে না পারলে নতুন কেউ জন্মাবে না।' কীভাবে সব কথা হুবহু মিলে যাওয়া সম্ভব? এই সবকিছুই আমাদের চেনাজানা ওসমান হাদিকে রহস্যময় করে তোলে। যেন তিনি অন্য ভুবনের কেউ–দ্য ম্যান, দ্য মিথ!

একটি কফিনের পাশে গোটা বাংলাদেশ

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে শহীদ হন। জীবনভর বাংলাদেশপন্থার রাজনীতি করে গেছেন তিনি। ভারতের কাছে নতি স্বীকার করেননি। এ কারণে তাঁকে জীবন দিতে হলেও জনতার হৃদয়ের সিংহাসনে জায়গা পেয়ে গেছেন। মানুষ আজও চোখের পানি ফেলে তাঁর জন্য। মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে তাঁর জানাজাটি ছিল স্মরণকালের সর্ববৃহৎ জানাজাগুলোর একটি। মানুষ চোখের অশ্রু আর ভালোবাসায় বিদায় দিয়েছে শহীদ প্রেসিডেন্টকে। বিএনপির বর্তমান ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান তাঁরই উত্তরপুরুষ। গত ১৯ ডিসেম্বর ভারতীয় সংবাদপত্র 'আনন্দবাজার' তাঁকে নিয়ে শিরোনাম করেছে–'খালেদাপুত্রের সম্বল দিল্লির বন্ধুত্ব, মুক্তিযুদ্ধও।'

আমরা অসীম বিস্ময়ে লক্ষ করলাম–বিএনপির পক্ষ থেকে এই সংবাদের কোনো প্রতিবাদ করা হয়নি। এর অর্থ কি ধরে নেবে বাংলাদেশের মানুষ? বিএনপি নেত্রী নিলুফার চৌধুরী মনি সম্প্রতি টকশোতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন–শহীদ ওসমান হাদিকে নাকি তার গিনিপিগ ছাড়া কিছুই মনে হয়নি! ডাক্তাররা তেলাপোকা কেটে সেলাই করে ছেড়ে দিলে সে চলতে পারে, কিন্তু ওসমান হাদি চলতে পারেননি। তাঁর জানাজায় আসা লোকজন নাকি ভাড়া করা! এদের ধৃষ্টতা কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে, কল্পনা করা যায়? আধিপত্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সবচেয়ে আলোচিত শহীদকে নিয়ে এই ভাষায় মন্তব্যও বিএনপি সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে জনতাকে। তবে কি তারা আওয়ামী লীগের পথেই হাঁটছে? ক্ষমতাকে নিশ্চিত করতে দিল্লির কাছে বিক্রি করে দিতে চাইছে নিজেদের মস্তক?

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের জানাজার চুয়াল্লিশ বছর পর সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা তথা মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে আরেকটি জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এবার কফিনে যিনি শায়িত, তিনি ভারতীয় আধিপত্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের আরেক মহানায়ক শহীদ ওসমান হাদি। একটি জানাজার পাশে এসে দাঁড়ায় গোটা বাংলাদেশ। লক্ষ লক্ষ জনতাসমুদ্রে গগনবিদারী কণ্ঠে স্লোগান ওঠে–'দিল্লি না ঢাকা? ঢাকা! ঢাকা!' বিএনপিসহ যারাই বাংলাদেশে প্রো-ইন্ডিয়ান রাজনীতি করতে চাইবে, তাদের জন্য শহীদ ওসমান হাদির জানাজা একটি বার্তা। এদেশের মানুষ দিল্লির দাসদের আর গ্রহণ করবে না। শেখ মুজিবের মতো নেতা বাংলাদেশপন্থি রাজনীতি করতে ব্যর্থ হওয়ায় করুণ পতন হয়েছিল, জানাজায় লোক খুঁজে পাওয়া যায়নি। অথচ শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, শহীদ ওসমান হাদির জানাজা পরিণত হয়েছিল জনসমুদ্রে।

বিদায় হে বিপ্লবী সবুজ পাখি!

শহীদ ওসমান হাদি আমাদের চোখে সামনে দিয়ে বিজয়ের বেশে হাসতে হাসতে আল্লাহর কাছে ফিরে গেলেন। তিনি এমনভাবে জিতে গেলেন, যার চাইতে বেশি আদতে আর জেতা যায় না। স্বল্প সময়েই শহীদ ওসমান হয়ে উঠেছিলেন বাংলাদেশের কণ্ঠস্বর। যেন তিনি এলেন, দেখলেন, জয় করলেন আর ফিরে গেলেন! তিনি বলেছিলেন, 'কখনও কখনও মৃত্যু জীবনের চেয়েও অধিক।' নিজের জীবনের মধ্য দিয়ে কথাটির প্রমাণ দিয়ে গেলেন শহীদ। আজ জীবিত ওসমান হাদির চাইতে শহীদ ওসমান হাদি সহস্র গুণ শক্তিশালী হিসেবে জালিমের বুকে কাঁপন ধরাচ্ছেন। খুনিকে আড়াল করে প্রকৃত কালপ্রিটদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে অনেকগুলো গোষ্ঠী। সরকারের ভেতরে ঘাপটি মেরে বসে থেকে ভারতের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে দিল্লির দাসানুদাসরা।

শহীদ ওসমান হাদি বলেছিলেন, 'অর্থহীন পঞ্চাশ বছর বেঁচে থাকার চাইতে অর্থপূর্ণ পাঁচ বছর বেঁচে থাকা বেশি সম্মানের।' দিল্লির দাসত্বকারী এদেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের জীবন হলো তেলাপোকা আর চামচিকার জীবন। মৃত্যুর সাথে সাথে এরা এমনভাবে মুছে যাবে, যেন পৃথিবীতে এদের কখনও অস্থিত্বই ছিল না! অন্যদিকে, শহীদ ওসমান হাদির জন্য এখনও চোখের পানি ফেলছে জনতা। শাহাদাতের এতদিন পেরিয়েও তাঁর কবরের সামনে থেকে ভীড় কমছে না মানুষের। দূরদূরান্ত থেকে লোকেরা এসে দোয়া করছে, চোখের পানি ফেলছে। মা তাঁর সন্তানকে ওসমান হাদি বানানোর স্বপ্ন দেখছেন, বাবা তাঁর ছেলেকে দেশ এবং উম্মাহর জন্য কুরবান করার শপথ নিচ্ছেন। এই তো জীবন! কারও এত বর্ণাঢ্য মৃত্যু, এত গৌরবোজ্জ্বল প্রত্যাবর্তন শেষ কবে দেখেছে বাংলাদেশ? হে বিপ্লবী বীর! হে সময়ের সাহসী সেনাপতি! এই নশ্বর পৃথিবীতে আপাতত বিদায়। দেখা হবে জান্নাতে ইনশাআল্লাহ।

Kuran-ı Kerim Ayeti

Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın. Bilakis onlar Rableri katında diridirler ve rızıklandırılırlar. (Âl-i İmrân 3:169)

Hadis-i Şerif

Kim Allah'tan samimiyetle şehitlik dilerse Allah ona şehitlerin makamını nasip eder. (Sahih Muslim 1888)

Dua sayısı: 500